শায়ের

শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের গল্প

ওরমান শহরটা মীরের জানার কথা নয়। এখন আর মনেই পড়ে না কতকাল আগে এখানেই এক মেহফিলে গাইতে এসে আলাপ হয়েছিল জীনাত বাইয়ের সঙ্গে। পহেলি নজরে মুগ্ধই হয়েছিলেন বলা চলে। গজলের প্রত্যেকটা শেরের সঙ্গে যেভাবে জীনাতের চোখে পলক উঠছিল পড়ছিল, যেভাবে চোখে বিদ্যুৎ খেলছিল কিংবা জল জমে উঠছিল তাতে মীর নিজেই ভারি অবাক হয়ে গিয়েছিল। সেদিন তো মহামান্য জাফর, আব্বাস, রঈস, নিয়ামত, তাবিজ, মোহশিন, মেহফুজ...তামাম দুনিয়ার সমস্ত নাম করা শায়েররাই আসরে হাজির ছিলেন। আর সবাই চাইছিলেন জীনাতকে কাব্যের দৌড় বোঝাতে। কিন্তু সাদামাটা মীরেরই কপালে সেই খোদার নূর এসে ঠিকরে পড়ল। মেহফিলের শেষে মীরকেই জীনাত এসে জিজ্ঞেস করল, আপনি বহু দূর থেকে এসেছেন, তাই না? আপনি ওরমানে আগে কখনো এসেছেন? না? এখানে গালিব একবার তিন দিন, তিন রাত্তির কাটিয়ে গেছিলেন।

সেদিন রাত্তিরে তাঁবুতে শুয়ে মীর জীনাতের কথাই ভাবছিল। অল্প বয়সের ছেলে, বড়োলোকের সুন্দরী মেয়ের নজরে পড়লে কিছুটা বিহ্বল তো হবেই। তার ওপর জীনাত বাইয়ের মতো মেয়ে। এত অল্প বয়সে এত নামডাক

তামাম হিন্দুস্থানে কারো হয়নি। একেকটা শের সুর দিয়ে আওড়ে গেলে হই হই পড়ে যায়। মনে মনে সবাই ওকে বিয়ে করতে চায়। এমনকী বুড়ো আব্বাসও এই আশি বছর বয়সে বেহায়ার মতন ওকে ভজাবার চেষ্টা করছিল।

তাঁবুর আলো তখনও টিম টিম করে জ্বলছে। ঘুমোবে না জেগে একটু শের পাঠ করবে এইসব ভাবছিল যখন মীর, হঠাৎ বোরখা পরে একটা মেয়ে ঢুকে পড়ল ঘরে। কে? কে? করে চেঁচাতে যাবে মীর কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না। বোরখার ভেতরের মেয়েটা আমিনা, মুখের পর্দা উঠিয়েই বলল, জীনাত বাই ডেকেছেন তোমাকে। এক্ষুণি চল।

ওই শীতের রাত্তিরে টিপ টিপ করে বৃষ্টিও পড়ছিল। আমিনা বলল, তুমি আমাকে চিনতে পারোনি? আমি জীনাতের দেখাশুনো করি। ছোটোবেলা থেকেই। মীর আমতা আমতা করে কী একটা বলতে যাচ্ছিল, কোথায় একটা ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শুনে চুপ মেরে গেল।

এত রাত্তিরে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ গোটা ওরমান শহরে ভয়ের সঞ্চার করে। ট্রেনে আসতে আসতে বুড়ো আব্বাস মীরকে বলেছিল শেখ সুলেমানের কথা। জীনাতের মা আরজুমান বানুকে অন্ধের মতো ভালোবাসতেন। নামাজ পড়ার মতো দিনে আটবার ওরমান শহরের দিকে মুখ করে আরজুমানের নাম করে শের আওড়াতেন। খোদা বক্সের সঙ্গে বাঁকানো ছুরি নিয়ে রক্তারক্তি লড়াই লড়েছিলেন আরজুমানের জন্য। খোদা বক্স খুন হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সুলেমানও আরজুমানকে নিয়ে ওরমান থেকে ফিরতে পারেনি। রাত্রে ঘোড়ায় করে ফিরছিলেন যখন খোদা বক্সের স্যাঙাতরা পেড়ে ফেলে ওঁকে ছাপান্নবার ছুরি মারে। তারপর লাথি মেরে খালের জলে ফেলে দেয়। খোদা বক্সের ভাইপো দেদার বক্স তখন আরজুমানকে নিয়ে ওঁর মহল্লায় রাখে। বাড়ির সমস্ত ধনদৌলত ছেড়ে দেয় আরজুমানকে, ভালোবাসা দেবারও চেষ্টা করে।

কিন্তু আরজুমান ওই যে মনে মনে সুলেমানকে ভালোবেসেছিল তার থেকে এক চুলও হটল না। বিরাট পালঙ্কে দেদারের পাশে শুয়ে শুয়ে আরজুমান সুলেমানের প্রিয় গজলটা মনে মনে গাইত। কিতনি কমজোর হ্যায় ইয়ে দুনিয়াওয়ালে। যব প্যার ঢুড়নেকো আয়ে তলোয়ার লায়ে। সুলেমানকেও ছুরি নিয়ে ভালোবাসার লড়াই লড়তে হয়েছিল।

এই দেদারেরই মেয়ে জীনাত। যে জীনাত ঘরে সুলেমানের তসবীর রেখে পূজো করে। আর নিঝুম রাতে ঘোড়ায় করে সুলেমানের আত্মা হন্যে হয়ে ঘোরে সারা ওরমান শহরটা। পাইক বরকন্দাজ ছাড়া আর কেউ ওই সময়টায় রাস্তায় নামে না। বিশেষ করে খোদা বক্সের কেউ রাস্তায় থাকলে তাদের পিছু নেয় কী একটা অশরীরী বস্তু। এর মধ্যেই ওদের সাতজনকে উন্মাদ করেছে সেই হাওয়া। প্রৌঢ় দেদার বক্স তো আজকাল বাড়ির বাইরে এক পাও যান না। সারাক্ষণ আগলে রাখেন মেয়েটাকে। মাঝে মাঝে রেগে উঠে বলেন, তুই সুলেমানের নাম নিস কেন? ব্যাটা মরে গিয়েও আমাদের কারোকে শান্তি দিল না।

এইসব কথা মনে আসতেই মীর তটস্থ হয়ে উঠল। একটা অভিশপ্ত মহল্লায় ঢুকছে ভেবে ভীতু মীর ফের মনে মনে নামাজ পাঠ করতে শুরু করল।

বাগানের দিকটা দিয়েই ঢুকিয়ে নিয়ে গেল আমিনা। সহসা মীরের চোখে পড়ল এক প্রৌঢ়া প্রদীপের আলোয় মুখ আদুল করে বসে। এরকমটা কিন্তু এরই গোঁড়া মুসলমান পরিবারে কখনো দেখা যায় না। বিশেষ করে রাত্তিরের এই সময়টায়। আমিনা বলল, উনি জীনাতের মা, আরজুমান বানু। বিশ বছর ধরে পাগল। ছ্যাঁৎ করে উঠল মীরের বুকটা। যেন একটা রূপকথার মানুষকে বাস্তবে দেখল। ফের ঘুরে তাকাল মীর। না কিংবদন্তীর সেই রূপের সাজ

আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। বুড়ো আব্বাস বলছিল, নেহাত আমি ছুরি চালাতে জানতুম না। না হলে আমিও কি লড়তাম না ওর জন্য!

দু-তিনটে মহল পেরিয়ে আমিনা ডান দিকে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল। মীর থমকে দাঁড়িয়ে গেছে দেখে পিছন ফিরে ফিসফিস করে ডাকল, এসো। উজবুকের মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন? মীর যেন একটু থতমত খেয়ে গেল আমিনা ওকে উজবুক বলল বলে। তারপরেই ভাবল, তাই তো! কেউ প্রেমে পড়লে তো ভারি উজবুক হয়ে যায়। মেয়েরাও সেটা বুঝতে পারে। না হলে আমিনার মতো একটা পরিচারিকা শ্রেণির মেয়ে...

মীর সাহাব! মীরের এবার ঘোর ভাঙল এক অদ্ভুত সুরেলা কণ্ঠের ডাক শুনে। মানুষ না দেখতে পেলেও ওর বুঝতে অসুবিধে হল না আওয়াজটা কার।

মীর তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল। অন্ধকারেই অনেকখানি মাথা ঝুকিয়ে কুর্নিশ করল জীনাতকে। গদগদ কণ্ঠে কী সব বলতে গিয়ে থমকে গেল। কালো জামার ভেতর থেকে জীনাত ততক্ষণে একটা বাঁকানো চকচকে ছুরি বার করে এনেছে। আর বলে চলেছে, আপনি নিশ্চয়ই এতক্ষণে আমাদের বাড়ির সব কাহিনি শুনেছেন কারো না কারো কাছে। সারা ওরমান শহর সে সব জানে। গত তিন বছর ধরে আব্বা আমার শাদি দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ওঁর পছন্দ যে লোকটা আমি তাঁকে ঘৃণা করি। ঘাউস মহম্মদ, যিনি ওর বাবা ছিলেন, তিনিই খান সাহেব শেখ সুলেমানকে প্রথমবার ছুরি মারেন। উনিই ফের শেখকে লাথি মেরে খালজলে ফেলে দেন। আমি ওর ছেলেকে কখনই বিয়ে করতে পারি না। কিন্তু আব্বার এসব বোঝার বুদ্ধি নেই। উনি জানেন না আমার মা শেখকে কতখানি পিয়ার করতেন। তাঁর পাগল হওয়ার কারণও শেখ সুলেমানের ভালোবাসা। কিন্তু আমার বাবা

কোনোদিনই সে-কথা বুঝবেন না। ওঁর কাছে ঘাউস মহম্মদ শানদার আদমি, বিরাট পুরুষ। তাই ওর ছেলের লম্পট চরিত্রটাও ওঁর কখনো নজরে আসে না। আমি আপনার সঙ্গেই লক্ষ্ণৌ চলে যাব। আপনার বউ হয়ে থাকব। আপনি আমায় নেবেন?

মীর আনন্দের আতিশয্যে তখন কী বলবে কিছু ঠাওরে উঠতেই পারল না। আলবৎ, আলবৎ বলতে বলতে আরও তিনবার কুর্নিশ করে ফেলল। আর তখনই জীনাত ওই ছুরিটা ওর হাতে দিয়ে বলল, এই নিন শেখ সুলেমানের ছুরি। এটা দিয়েই তিনি খোদা বক্সকে দ্বন্দ্বে হারিয়েছিলেন। এই ছুরি নিয়ে কেউ কোনোদিন হারে না। এই ছুরি দিয়েই সুলেমানের দাদু ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেবের বন্ধু ইলিংওয়র্থকে খুন করেছিলেন আবধে। এই ছুরি দিয়েই কাল

সবার সামনে আপনি ঘাউস মহম্মদের ছেলেকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করবেন। নচেৎ এখান থেকে আমায় নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। ওদের চর সর্বত্র। আপনি খোদাতাল্লার অশেষ কৃপায় এই ছুরি পেয়েছেন। আপনি জিতবেনই।

আহ্লাদের জোয়ারে ভাসমান ভীতু মীর এক ঝটকায় ছুরিটা নিয়েই বলে উঠল, কালই আমি কুত্তার বাচ্চার জান নেব এই দিয়ে। তারপর আপনার পাশে এসে এই ছুরি রাখব। বলেই ফের ওর খেয়াল হল ভদ্র মেয়ের সামনে ওরকম কাঁচা বুলি সভ্য মীর এর আগে কখনো বলেনি। লজ্জাও হল কিছুটা, কিন্তু আনন্দের তরঙ্গে তখন সেই শরম ভেসে গেল।

রাত্রে নিজের তাঁবুতে ফেরার আগে মীর একবার ঢু মারল বুড়ো আব্বাসের তাঁবুতে। ভড়ক ভড়ক নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। মীর চাচা, চাচা করে দুই ঠেলা মারল ওকে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল আব্বাস, তারপর অকথ্য

গালিগালাজ শুরু করল। বত্তমিজ বেয়াদব! রাত্তিরে বুড়োদের ঘুম ভাঙায়। এরা কোনোদিনই ভালো শায়ের হতে পারবে না। কখনোই না।

তখন 'চাচা-চাচা' করে মীর বোঝাল বুড়োকে সমস্ত কথা। আর একেকটা কথার সঙ্গে সঙ্গে বুড়োর চুল দাড়ি দাঁড়িয়ে যেতে লাগল। তারপর যেই ছোরার কথা উঠল অমনি বুড়ো চিৎকার করে বলে উঠল, নহি! নহি! কভি নহি! এ কখনোই হতে পারে না। এ হবার না। তাহলে বলি শোনো...

ঘাউস মহম্মদের ছেলে জিগর পাঁচ বয়সে থেকে ছুরি খেলে। বারো বছর বয়স থেকে মদ খায়। আঠারো বছর বয়স থেকে মেয়েদের উপর হুজ্জতি করে। কেউ যে ওকে ঘাটায় না তার কারণ ওর বাড়ির পয়সা আর ওর গায়ের জোর। একটা মোষের মতো জোর ওর, যেমনটা ওর বাপের ছিল। কিন্তু জীনাত ওকে কোনোদিনই শাদি করবে না। দেদার বক্সও মেয়েরে বিয়ে দিয়ে ছাড়বেন ওর সঙ্গে। শেষে জীনাতের যখন সতেরো বছর বয়স ও জানিয়ে দিল ওর মনোনীত সাত-সাতজন পুরুষকে যদি ছুরির লড়াইয়ে খতম করতে পারে জিগর তবে ও না হয় বিয়ের কথা ভেবে দেখবে। তা এতদিনে ছ-জন তো জিগরের হাতে মরেছে। তুমি মরলেই জিগর চড়ে বসবে জীনাতের বাড়িতে শাদি করো শাদি করো' বলে। আর মুশকিল এই যে, জীনাতের পছন্দ যত তোমার মতো ন্যাকাবোকা শায়ের-টায়ের, যারা কোনোদিনও জিগরের সঙ্গে লড়ে পারবে না। ছ-জন গেছে। তুমি মানে মানে কেটে পড়ো।

মীরের গলায় ততক্ষণে যেন বরফ জমে গেছে। ছুরিটা বার করে দেখিয়ে বলল, কিন্তু এই ছুরিটা! আমি কাল কী মুখ নিয়ে এই ছুরি ফেরত দিতে যাব?

সট করে ছুরিটা মীরের হাত থেকে কেড়ে নিল আব্বাস। বলল, কাল তোমায় যেতেই

হবে না কোথাও। তুমি গোছগাছ করো। আমরা এখনই হেঁটে স্টেশনে যাব। কাল ভোরের ট্রেন ধরে পালাব। আর কোনো কথা তোমার আমি শুনতে চাই না। তোমার আব্বাকে বলে আমি তোমায় মেহফিলে এনেছি। এখন আর কোনো কথা শুনব না।

রাতের অন্ধকারে দুটো কাপুরুষ হেঁটে স্টেশনের দিকে রওনা হল। যেমনটি ঠিক ত্রিশ বছর আগে কেটে পড়েছিল আব্বাস ছুরির লড়াই থেকে বাঁচতে।

ওরা লক্ষ্ণৌ ফিরে যাবার উনিশ দিন পর খবর পৌঁছোয় বিখ্যাত গজল গায়িকা এবং পরমাসুন্দরী জীনাত বাই ছুরি দিয়ে নিজের মুখ ক্ষতবিক্ষত করেছেন। হিসেব করে দেখা গেল ঘটনাটা মীরদের চলে আসার পরের দিনই। কিন্তু ওই বিকৃত কুৎসিত মুখের মেয়েকেই সাগ্রহে শাদি করেছেন পরলোকগত রহিস আদমি ঘাউস মহম্মদের পুত্র জিগর।

আজ কুড়ি বছর পর মীর ওরমানে ফিরেছে। সারা হিন্দুস্থানে সবার সেরা শায়ের এখন মীর মুশারফ লখনৌয়ী। তাঁকে আহ্বান করে নিয়ে আসছেন ওরমানের রহিস জিগর মহম্মদ। এই মেহফিল প্রতি পাঁচ বছর অন্তর হয় এককালের শ্রেষ্ঠ গায়িকা জীনাত বাইয়ের স্মরণে। যিনি দশ বছর আগে দেহ রেখেছেন।

শহরটা খুব অচেনা ঠেকছে মীরের। মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়ল ওরই রচনা এবং ওরই প্রিয় শেরটা, আজব হ্যায় ইয়ে নগরী যহা পিয়ার মিলে। আজব হ্যায় ইয়ে নগরী যহা পিয়ার ভি ঘায়েল হো! মীর জোব্বার ভেতর থেকে শেখ সুলেমানের বাঁকানো ছুরিটা আরেকবার বার করে দেখল ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। পুরোনো সেই ভয়াবহতাটা এখনও অটুট আছে। লক্ষ্ণৌয়ে কেউ মীরকে যখন

জিজ্ঞেস করেন, সাহাব, শাদি কিউ ন নকিয়ে? মীর জোব্বার থেকে ছুরিটা বার করে দেখিয়ে দেয়।

বহু পরিচিত এই ছুরিটা আজ মীরের খুবই অদ্ভুত অদ্ভুত ঠেকছে। কেন, কে জানে!